রৌরব সাহিত্য পত্রিকার ইতিবৃত্তে

সংক্রান্ত নিবন্ধ

'জিও রৌরবিয়ানস'

কলমে বিশিষ্ট গল্পকার ও কবি সাধন দাস মহাশয়

জিও, রৌরবিয়ানস!

সাধন দাস

বনগাঁ থেকে বহরমপুর এসেছি চাকরি নিয়ে। লেখালিখির চর্চা করি। একটা সংঘ খুঁজছিলাম। বহরমপুরে বনগাঁর 'ব' ছাড়া কিছুই চিনিনে। হারিয়ে যাওয়া মানুষের মতো ঘুরছি। বিমল কালচারাল হলে নাটক দেখতে গেছি। আলাপ হলো চাঁদু মানে শুভ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে। একটা আস্ত চুম্বক, আকর্ষণী ঝড়। সংগে একদল সাঙ্গপাঙ্গ। শুয়োরে চেনে ঘেঁচু। ভিড়ে গেলাম। শান্তিময় (মুখোপাধ্যায়) কবি। মহা খিস্তিবাজ। প্রথম দেখা, সবে আলাপ, গাল পেড়ে মেজাজ টংয়ে তুলে দিলো। মনেমনে ভাবছি, ছাড়া পেলেই পিঠটান দেবো। সমীরণ (ঘোষ) আর এক কবি, মিষ্টি মিষ্টি কথা। ঘাড়ে হাত রেখে ভিজিয়ে নরম করে ফেললো। শান্তিময় সমীরণ চাঁদুর চুম্বকে সেঁটেই ছিলো। গরমে নরমে আমিও সেঁটে গেলাম। দলের কোণে অন্ধকারে মিশে ছিলো আদিবাসী টাইপের কালো হাড় জিরজিরে এক ছোকরা (অচিন্ত্য বসু) কাজল। কবিতা লেখে। সংগে গম্ভীর নানুদা (নারায়ণ ঘোষ), কথা না বলা নাসের (হোসেন), চুপচাপ অসীমদা(দাস)। আমরা সবাই লিখতুতোদের বংশধর মানে লেখক পাল।

খাগড়া বি বি সেন রোডে, হিদুদার চায়ের দোকান লাগোয়া চার দেওয়ালে এক খুপরিও জুটে গেলো। গুহার চেয়ে অন্ধকার। চুনখসা, দাঁত বেরুনো দেওয়াল। পূর্বসূরিদের আঁকিবুঁকি, জ্যামিতি, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, ইঁদুর বাঁদর হাতি ঘোড়ায় গিজগিজ যেনো সভ্যতার ইতিহাস। ভীড়ভাট্টার ফাঁকে ইটের খাপরা দিয়ে শুভ সমীরণ শান্তিময় খোদায় করে দিলো 'আবহমান ১২৩'। গুহার বংশধরেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, থাকিবে সে প্রহরায় সেই হেতু 'আবহমান'। এবং শুভ, সমীরণ, শান্তির, শু স শা কিংবা 'ছবি, গদ্য, পদ্য'র ট্রায়ো, ১২৩। সে যাই হোক দিনে রাতে টুনটুনি হলুদ বাল্ব জ্বলেই থাকে। নইলে কিছুই দেখা যায় না। দরোজা খুললে আলোর হলুদ যাত্রা শুরু হয়, দেওয়ালের বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছায়া। দরজা পেরিয়ে উঁকি মারার দম থাকে না সে আলোর। সমীরণ কবি কাম সিভিল ইঞ্জিনিয়র। চাঁদু বললো- অতীত ধুয়ে মুছে হোয়াইট ওয়াশ করতে কটুক চুন লাগবে দেখতো, সমীরণ। আমরা তাকিয়ে থাকলাম সমীরণের মুখে। স্বপ্ন দেখছি, নতুন চুনের সাদা ফটফটে দেওয়াল ছিটকে আলো পেরিয়ে যাচ্ছে চৌকাঠ। সমীরণ আঁক কষছে। হিসেব কষে কষে অস্থির। খাতা মেঝে ভরে ফেললো। হিসেবের গভীরে তাকিয়ে বললো- পঁচিশ কেজি।

- অসম্ভব, ভুলভাল বকছিস!

সবাই মিলে সমীরণকে ঝাঁকুনি দিলাম- হোঁশ মে আ যাও ইয়ার। এলেবেলে পুচকে ঘর ওয়াশ করতে এতো চুন লাগে!

সমীরণ ফের মাথা চুলকে কঠিনেরে ভালোবাসিলাম মুখ করে বললো- পয়েন্ট ফসকে গেছে। আড়াই কেজি।

হুররে! ভুলের নবিশিতে আবহমানের নতুন আলো ছিটকে পড়লো বাইরে।

সমীরণ প্রকাশ করে 'স্বয়ম্বর' পত্রিকা। কাজল 'তমোঘ্ন'। খুপরি আবহমানে সম্পাদক, লেখকের ছড়াছড়ি। সম্মিলিত উদ্যোগে আবহমান ১২৩ নাম দিয়ে চার পাতার একটা বুলেটিন বেরুতে না বেরুতে চাঁদু বের করলো 'রৌরব'। নরকের চ্ছটা উঁকি দিলো গুহার গর্ভমুখে।

বনগাঁর 'ব' কে টেনেটুনে আঁকুড়ি খাটিয়ে কবিতার 'ক' লিখে পড়িয়েছিলাম। শান্তিময় বললো, আকাট মূর্খ। কিস্যু হয়নি।

ও থাকতো বহরমপুর নতুন জেনারেল হাসপাতালের কোয়ার্টারে। ছুটির দিন দেদার ফাঁকা। খিস্তি খাওয়ার টানে ঢুকে পড়তাম ওর আস্তানায়। আমাকে শেখাতো বাংলা ছন্দ। 'বিজোড়ে বিজোড় শ্লা, জোরে দিবি জোড়'। যদি না পারিস, তবে তোর... মিতাক্ষরে শেখালো অক্ষর গোনা, শ্রুতির গতিতে পুরো আধা ঝুরো সত্যেন দত্তীয় শ্বাসাঘাতে গতির ভাষা। জীবনানন্দীয় পয়ার, মহাপয়ার। মনে হতো, এতোদিন শুধু হাবিজাবি আঁকিবুঁকি কেটেছি। এবার মহাকবি বনে যাব নির্ঘাত! শান্তিময় বলতো- বনগাঁর শেয়ালরাজা, নে চা খা।

সেদিন পূর্ণিমা রাত। ভাগীরথীর মখমল ঘাসের তীরে চাঁদু, আমি, সমীরণ, শান্তিময়, কাজল, কমল (স্বনামধন্য ওস্তাদ দাউদ খাঁর অকাল কুষ্মাণ্ড পুত্র); শুয়ে বসে গা জড়াজড়ি করে লতায় পাতায় পেঁচিয়ে আমরা। ওরা গাঁজা খেয়ে টর। ভয়ে ভালো ছেলে আমি না খেয়ে। পূর্ণিমার স্রোতে জ্যোস্না বয়ে যাচ্ছে। দিগন্ত বরাবর নদীর উদ্দেশে তাকিয়ে আছি। দূরে চিতা জ্বলছে। কোনো মানুষের ভব যন্ত্রণার মুক্তি ঘটছে। থার্ড ডিভিসান স্কুলফাইনাল পাশ চাঁদু আবিষ্কার করলো, আমি বনগাঁর মুখ্যুভূত। বোঝালো, 'ভারতবর্ষের মিলিটিরিয়াইজেশন অব দ্য ইকনোমি'। ওয়াটসন, ভোওমল, হেণ্ডারসনকোয়ান্ট পড়া ইকনোমিক্সের ছাত্র আমি, নতুন অর্থনীতির আলোয় ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁপে উঠলাম। অর্থনীতির চারখানা বেসিক পিলারগুলোতে ভূমিকম্প শুরু হলো। একটু একটু করে জেগে উঠছি। নবজন্ম হচ্ছে আমার। এ্যাদ্দিনের অহংকার, অর্জন, খানখান হয়ে যাচ্ছে। শান্তিময়, চাঁদু সমীরণ সবাই মিলে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে আমাকে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় তনছট করছি। আর নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাচ্ছি। সমীরণকে বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না। ভিতরে আগুন। 'তনছট' শিখেছি ওর কাছে। ও ছিলো নতুন নতুন শব্দের আবিষ্কারক। অন্তরাত্মার স্রোতে বয়ে চলা স্বপ্নের কারিগর। মনের গহীনে মুশকিল আসান। আমার বুকে মাথা রেখে, রবীন্দ্রনাথকে উল্টে দিয়ে গাইলো 'আছে দুঃখ আছে কষ্ট 'অজ্ঞান' দহন মাঝে.. .. দলা পাকিয়ে তখন আমরা সবাই গানের ঘোরে বিভোর, ভিন্ন ভিন্ন আমি যেনো একটাই অনুভবে ঝিকিমিকি তারার সূচিমুখ আলোয়, চাঁদের উদভাসিত জ্যোৎস্নায় ভাগীরথীর স্রোতে মিশে সাগরের পানে ভেসে চলেছি। দুকূল ভেসে যাচ্ছে স্রোতের জলে ছলকে ওঠা ঝিলিমিলি জল-মুক্তোর উদভাস প্রতিফলনে।

রৌরব বড়ো হতে হতে তখন বহরমপুর ছাড়িয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির রাজধানী কোলকাতা শহরে সাহিত্যের নোঙর ফেলেছিলো। মুঠো হাত উঁচু করে চারপাতা, আটপাতা, ষোলপাতা ছাড়িয়ে বুদ্ধিজীবিদের টনক নাড়াতে শুরু করেছে। রেজাউল করিম, রাজেন উপাধ্যায়, সুশীল ভৌমিক, অমিতাভ মৈত্র, পম্পু মজুমদারদের চ্ছটায় একটু একটু করে শহরের উজ্জ্বল স্থাপত্যগুলো চিনে নিচ্ছিলো। আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে শিল্প সংস্কৃতির দেওয়ালে শিংহীন মাথা ঢুঁসোতে চেষ্টা করছিলাম।

রৌরবের গায়ে তখন কুমলের লেজ তুলে নেচে বেড়াচ্ছি। ছাপার অক্ষর হয়ে ঢোকার এলেম তৈরি হয়নি। রৌরবের একটা হাইপ্রোফাইল মেরুদণ্ড প্রথম সংখ্যা থেকেই খাড়া করে দিয়েছে শুভ, সমীরণ, শান্তিময়। ছারপোকা, এঁটুল, উকুনদের কথা, ধূর! শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়ও রৌরবের দপ্তরে বাতিল হয়ে যাচ্ছেন। বিনয় মজুমদার অনেক ফেল মেরে, গুচ্ছকবিতা থেকে বেছেগুছে আর আগের দুই চট্টোপাধ্যায়ও ফিরে ফিরতে পদ্য পাঠালে তবে ছাপা হচ্ছে। এতো বন্ধু লেখক কবি! লিখতে না পারা পর্যন্ত লজ্জার কিছু ছিলো তো বটেই। বুকের পাতায় উষ্ণতার প্রিন্টে তখনও প্রুফরিডিংএর কোনো ঢ্যাড়া দাগ আমার পড়েনি। লড়ে যাচ্ছিলাম।

কবে যেনো 'স্বয়ম্বর','তমোঘ্ন' মার্চ করে গেছে রৌরবে, মার্চ। নির্ভুল সাজিয়ে গুছিয়ে টানটান বেয়নেট লাগানো বন্দুকের মতো রৌরবকে সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে উঁচিয়ে ধরেছিলাম। চাঁদুর প্রুফ রিডিং, পেজ মেকাপে সমীরণের প্রপোরশন আর শান্তিময়ের বালান্সিং সামলাতে অস্থির হয়ে থাকতো ছাপাখানার কম্পোজার সুকুমারদা।

'আবহমান, থেকে শুরু করে গোলাপগুচ্ছের মতো প্রেমজ এবং ঝাঁকঝাঁক বুলেটের মতো বিপ্লবী সব নাম, রেজিষ্ট্রেশনের জন্য পাঠানো হচ্ছিলো দিল্লির দরবারে। পুষ্প এবং বুলেটগুলো মিসফায়ার হয়ে ফিরে আসছিলো। ওই নামগুলো নাকি আগেই ফায়ার হয়ে গেছে। খেপে গিয়ে চাঁদু পাঠিয়ে দিলো নরকের নাম 'রৌরব'। ওটাই সরকারী কয়েদির তকমা নিয়ে ফিরে এলো। দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে আমরা বললাম, 'রৌরব' চতুর্দশ নরকের জঘন্যতম ঠিকই, তবে দিকে নয়, আমরা নরক থেকে মার্চ শুরু করেছি, লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট.. ..

সন্ধ্যের পরে কবিতা আর কাঁদন(দোকানি)দার তেলেভাজায় সরগরম হয়ে উঠতো বুক কর্ণারের ধাপি, কোনোদিন হিঁদুদার চায়ের দোকানে ধোঁয়া উড়তো বেঞ্চিজুড়ে। আগের দিন আড্ডা ভেঙে ফেরার পথে ঠিক হয়ে থাকতো লেখার বিষয়। পরেরদিন আড্ডা জমে উঠত নতুন নতুন পদ্য গদ্যে। এর ওর পকেট থেকে লাফ মেরে লেখাগুলো বেরিয়ে পড়তো বুকের ধুকপুকুনি নিয়ে। কে

আগে পড়বে লাফালাফি শুরু হতো। পড়া শেষ হতে না হতে জ্ঞানের পাঁচফোড়নে ভাজা ভাজা হতে থাকতো লেখা। শব্দ, বাক্য, ভাব, ভাষা, ছন্দ ফুটতে শুরু করতো। কবি বা লেখক বেচারি হেঁচে কেশে কেঁদে সংশোধনের অনুশীলনে নাজেহাল!
অসীমদা প্রায় কিছুই বলতো না। অসীমদাদের হলঘরে বইয়ের আলমারি ছিলো মিছিল করে। আলমারিগুলো, বইয়ের পাহাড় সংগে আনতে পারে না বলে, জ্ঞানগুলো মাথায় নিয়ে ঘুরতো। নেই-বইয়ের পড়ুয়া আমি, অসীমদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। অসীমদা চুপচাপ। জ্ঞানে টইটুম্বুর মুখে নাহি বাত। খোঁচাখুঁচি, পিছনে লাগালাগি তবু নাহি কাত।
- অসীমদা কিছু বলুন?
- চ্ছুপ কেনো পণ্ডিত? চাঁদু অসীমদার থুতনিতে ঠোনা দিতো আর হেঁড়ে গলায় গাইতো - কেনো কিছু কথাআ..বলো না, শুধু চোখে চোখে চেয়ে..
ক' অক্ষর গো মাংস আমাদের বুভুক্ষু দৃষ্টিতে অসীমদা অস্থির হয়ে বলতো- নাসের খুব কম কথা বলে। ও এখনো কিছু বলেনি। নাসের এমন গো-বেচারা যে প্যান্টালুন খুলে আমাদের গণহিসির লাইনে দাঁড়াতেও লজ্জা পেতো। চাঁদু তখন
- ক্কেনো রে, এতো লজ্জা কিসের ??? বলে এক পাক নেচে গেয়ে উঠতো
- বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে.. ঝরা বন বকুলের .. ..
তলতলমে নাসের ছিলো ছুপা রুস্তম, রহস্যময়। ওর কবিতায় বুলেট, বন্দুক, কঙ্কাল, ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘুরে বেড়ায়। শুনেছি, ওদের বাড়িতেও প্রচুর বই আর ওর সুন্দরী বোন আছে। দেখার জন্যে আজে বাজে ধান্দা নিয়ে দল বেঁধে ওদের বসার ঘর পর্যন্ত গিয়েছি। কিন্তু কী আশ্চর্য রহস্যময় কায়দায় নাসেরও পাণ্ডিত্য আর বোনকে লুকিয়ে ফেলতো, কোনোদিন দেখতে শুনতেও পাইনি, হাঃ!

পাঁচফুট দশ ইঞ্চি ঢ্যাঙা চাঁদু। চৌকাঠে ঠোক্কর না খেয়ে আড্ডায়, ছাপাখানায় ঢুকতে পারতো না। আসলে ছিলো পুরো ছ'ফুট। ভোলামন, নিজের মাপটাই জানতো না। দরজার উপর চৌকাঠে ঠোক্কর খেয়ে জান কয়লা করে ফেলতো তবু মাথা নোয়াতো না। বুকটা ছিলো দরজার কপাটের চেয়ে দরাজ। ঘরে পথে মাঠে যেখানেই থাকতো একঘর হয়ে থাকতো। জলজ্যান্ত সাটপাট কথা, সাফসাফ কাজ। ঢাকঢাক গুড়গুড় ছিলো না। ওই ছিলো পালের ম্যাড়া (মোড়ল), রৌরবের সম্পাদক।

এস ইউ সি আই সি (রাজনৈতিক দল) চাঁদুর চৌম্বকত্বকে টেনে ধরলো। চুম্বকের গায়ে সেঁটে থাকা লোহার টুকরোগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়লো এস ইউ সি আই এর দিকে। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদের ছিলোই, প্রতিবাদের যুক্তি, সততা, মূল্যবোধের আদর্শে ওদের আনুগত্য দেখে ভীড়ে গেলাম। রবীন ছিলো আমাদের অব্যয় সংযোজক। গ্রুপ রিডিং করতাম। স্বপনদা, কুনালদা ছিলো গাইড।

সূর্য সিনেমা হলে অশ্লীল সিনেমা চলছে। রৌরবের ব্যানার টাঙিয়ে হলের সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। বনগাঁ থেকে চুপিচুপি এসেছে আমার প্রেমিকা, শ্রীরূপা। সেও ভিড়ে গেলো আন্দোলনে।
- অশ্লীল সিনেমা চলছে না। চলবে না।
দিল্লিতে অন্ধদের উপর লাঠি চার্জ হলো। রৌরব প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করলো শহরে।
- অন্ধদের উপর লাঠি চার্জের জবাব চাই, জবাব দাও।
৫ আগষ্ট, এস ইউ সি আই সির মিছিলে চললাম, বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে। রাতে দল বেঁধে শুয়ে পড়লাম কোলকাতা মেডিকেল কলেজের বে-ওয়ারিশ করিডোরে। মানুষের লাথি, নার্স দিদিমণিদের ছেই ছেই। আহা, কী ঢেউ তোলা আন্দোলনের ঘুম! আমাদের গায়ে ছাপ্পা পড়ে গেলো, এস ইউ সির ধামাধরা।

শহর থেকে অনুপম ভট্টাচার্য, সন্দীপ বিশ্বাস, অমিতাভ চক্রবর্তী, উমাপদ কর, তাপস সরখেল, কৌশিক রায়চৌধুরী, পলাশ, রাজন, শিব .. ..। টেঁকারায়পুর থেকে আবুল বাশার, কাঁদি থেকে হৃষিকেশ চক্রবর্তী, হরিহর পাড়া থেকে রকিবুদ্দিন ইউসুফ, ডোমকল থেকে শেখ আনিস, হাওড়া থেকে গোপাল ভট্টাচার্য, দত্তপুকুর থেকে গৌতম সেন, উল্টোডাঙা থেকে সত্যজিত ভট্টাচার্য .. .. বহু সব নাম লিখতে না পেরে, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এই অনুচ্ছেদে জমা রেখে যাচ্ছি। সবাই মিলে আমরা সবাই; উদ্যম, সৃষ্টি, শ্রম, আর্থিক সহায়তার বন্ধুত্বে গৌরবে, সৌরভে.. .. রৌরবে সেদিন রত্নময় চাঁদের হাট।

সি পি এম দেখলে এতো একটা বড়ো চাঁই। তুলতে পারলে দলের প্রচারে, ভোটে, শিল্প সংস্কৃতির উইয়িংএ একটা বড়ো দাঁও। কিন্তু চাঁদেরা যখন টোপ যখন গিললো না। আদর্শগত যোগাযোগ যতখানি করলে তার চেয়ে শহরজুড়ে গেয়ে বেড়ালে বেশি। রটে গেলো 'রৌরব' বামফ্রন্ট সাপোর্টেড পত্রিকা। কংগ্রেসের শহর, বহর কম পুরে চলতে ফিরতে শুনতে পাচ্ছিলাম, সি পি এমের ছা যাচ্ছে। তখন সি পি এমের যা দাপট, বামপন্থায় বিশ্বাস মানেই সি পি এমের লেজুড়। আমরা সি পি এম হয়ে গেলাম।
অনুপম তখন যুব কংগ্রেসে ডাকসাঁইটে নেতা। ভিতরে বাইরে অনেকেই ভাবে অনুপম আছে মানে কংগ্রেসের আখড়া।
তখন জেনে গেছি, পথে হাটে ঘাটে এমন কি আমাদের ভাতের হাঁড়িতেও রাজনীতি ঢুকে গেছে। জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে দ্বান্দ্বিকতার অস্তিত্ব। মার্ক্সবাদ ছেড়ে পালাবার পথ নাই, রাজনীতি আছে পিছে। মিচকে চাঁদু মাঝে মধ্যেই খিকখিকিয়ে বলে উঠতো- বৌয়ের সাথে যখন ইন্টুমিন্টু খেলবি, খেয়াল রাখবি মার্ক্সবাদ সম্মত হচ্ছে কিনা? নইলে আদর্শগত চ্যুতি ঘটে যাবে। হিঃ হিঃ হিঃ.. ..
-ইন্টু মিন্টু মানে?
-ইন্টু মানে মিলনাত্মক, মিন্টু মানে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব, বুঝলি ... ভূত কোথাকার!
চান্স পেলেই সবাইকে একবার ভূত বলে নেওয়া চাঁদুর অভ্যেস।
রাজনীতির সাথে পাল্লা দিয়ে রৌরবের বন্ধুত্ব একটু একটু করে ঢুকে যাচ্ছিলো, পরস্পরের ভাতের হাঁড়িতে। আসা যাওয়া শোয়া, বসা, খাওয়া; দেওয়া, নেওয়া চলছিলো মহা সমারোহে। পারিবারিক অনাত্মীয়তার আড় বাঁধনগুলো ভেঙে পড়ছিলো। যে যখন যার বাড়িতে আস্তানা নিতো ভাবখানা এমন করতো যেনো নিজের বাড়িতেই আছে। বনগাঁয় আমি, জয়দেব (আচার্য) অরুণ (বৈরাগী) মদন (হালদার) চারজন চারজনের মাকেই মা বলে ডাকতাম। মায়েদের আচরণে অকৃত্রিম আদর শাসন, স্নেহ-উষ্ণতা ঝরে পড়তো। অনুভব করতাম, আমাদের ক্রমান্বয় অত্যাচার, কাকিমা দাদা বৌদিদের প্রশ্রয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

খবর পেলাম, নকশাল আন্দোলনের ডাকসাইটে নেতা আজিজুল হক জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। খবরের কাগজ ছবি ছেপেছে। লুঙি পরে খালি গায়ে মানুষটা উবু হয়ে বসে আছে। হাড়-গোড় সম্বল দেহ। হারমোনিয়ামের রীডের মতো পাঁজর গুনে নেওয়া যায়। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, ঠেঙানি, টাঙানি ভালোই খেয়েছেন, পায়ের তালুতে রুল পেটানি আর পেটে না খেয়ে চেহারা দড়ি হয়ে গেছে। দেশের জন্যে দড়ি। অতএব ফাঁসিতে লটকাবার তাগিদে ছুটলাম। আজিজুল হক মুহূর্তে আজিজুলদা। মানুষকে আপন করার আশ্চর্য ক্ষমতা। চারপাশ ঘিরে বসেছি। জেলেও এমনই জমিয়ে বসতেন। এঁড়েপাকা এক গণতান্ত্রিক ছিলো জেল কয়েদির দলে। সে সমাজতান্ত্রিক, নকশাল আন্দোলনে ধরা পড়েই জেলে ঢুকেছে। পুলিশের ব্যাটনে সমাজতন্ত্র-মন্ত্র গুটিয়ে তখন তাঁর গণতন্ত্রই ম্যা, গণতন্ত্রই ব্যা। ফন্দি এঁটে আজিজুলদা দল বেঁধে এঁড়েপাকাকে জিজ্ঞেস করলেন- তোর বাবার নাম কি?
-গোপালচন্দ্র সরকার। (কাল্পনিক)
- ঠ্যাঙানি খেয়ে দেখছি, বাপের নামও ভুলে গেছিস! তোর বাপের নাম খগেন।
- না না, আজিজুলদা বাবার নাম গোপাল... ... ভালো মনে আছে।
- না, আমি বলছি খগেন।
- না, গোপাল।
- বেশ ভোট হোক। এঁড়ের বাবার নাম গোপাল। সবাই হাত তোলো।

আগে শেখানো ছিলো। একা এঁড়ে ছাড়া কেউ হাত তুললো না।

- আচ্ছা, এবার এঁড়ের বাবার নাম খগেন।

এঁড়ে বাদে সবাই হাত তুললো। আজিজুলদা এঁড়েকে বললেন- বুঝলি, এর নাম গণতন্ত্র।

গল্প শুনে আমরা গলগল।

বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে আয়োজন করা হলো এক সেমিনার। জেলার সম্মানীয় মার্ক্সবাদী পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। বিশেষ বক্তা আজিজুল হক। মনে আছে, এস ইউ সি আই সেই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেনি। মাইকিংএর দায়িত্ব ছিলো আমার উপর। আর এস পি (রাজনৈতিক দল)র সম্মানীয় প্রমথেশ মুখার্জী সেমিনারে বলবেন। আর পাঁচজন বক্তার নামের সাথে প্রমথেশ মুখার্জী নামের বদলে সগর্বে মাইকে ধ্বনিত করে এলাম ‘বক্তব্য রাখবেন, প্রমথেশ বড়ুয়া’। বন্ধুরা খেপে বোম। আমি ভয়ে অস্থির। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত চেয়ে এই বুঝি গোটা শহর, নিদেন পক্ষে আর এস পি ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ঘাড়ে! রৌরবে জরুরি ক্লোজডোর মিটিং বসে গেলো। ভুলের রেহাই পেতে সবাই মিলে কী করা উচিৎ, কী উত্তর দেবো, ক্ষমা চাইলে রেহাই মিলবে কিনা? অস্থির অবস্থা! সেমিনারে উপচে পড়লো ভীড়। উত্তেজনার ছড়াছড়ি। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। অপূর্ব আমাদের শহর-চরিত্র সম্পর্কে গর্ধভ ধারনা। কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে নিচু গলায় না শোনার ফিসফাস হাসাহাসি করলো বটে অভিযোগ জানাতে একজনও আসেনি। হয়তো সাংস্কৃতিক শহরের উদারতা! বইয়ে, সেমিনারে নিরাপদ তাত্ত্বিক লড়াইয়ে গলা ফাটিয়ে আমরা যতখানি লড়াইবাজ, বাস্তবে, সামনা সামনি, তার চেয়ে কি সহনশীল? নইলে গালাগালির বন্যায় সে যাত্রায় ডুবে মরা উচিত ছিলো আমাদের। শহরে কিন্তু রটে গেলো, ‘রৌরব’ মরা নকশালের লেজুড়। আমরা নকশালপন্থী হয়ে গেলাম।

বাশারদা প্রেম করেছে সাহানার সাথে। কমলের মাসি। আধাজমিদার নন্দিনী। আর চাষার ছেলে বাশারদা, আধাহাইস্কুলের পাতিকেরানি। কোথায় নেতাজী কোথায় পিঁয়াজি! প্রেমিকস্য লাঠ্যৌষধির ভয়ে বাশারদা গ্রামছাড়া। আণ্ডার গ্রাউণ্ড জুটলো আমার ডেরায়। বাশারদার কাছে সেই শুরু হলো আমার গদ্য শেখার মকশো। শব্দের পর শব্দ বসিয়ে শব্দের সিমেন্টিং, কঠিন কঠিন সব কায়দা কানুন। বাক্যের সাথে বাক্য জোড়ার কৌশল। অনুচ্ছেদ ভাঙা, তৈরি করা। কেমন করে শুরু হয় গল্পের মুখপাত.... গল্পে গল্পে দু’জনের দু’বাণ্ডিল বিড়ি চুষে ফতুর হয়ে যেতো। ঘরময় ছড়িয়ে থাকতো পোড়া টুকরোগুলো। কুড়িয়ে কুড়িয়ে দ্বিতীয়বার টানতাম, যতক্ষণ না সুতো পর্যন্ত পুড়ে ফুরিয়ে যেতো, বাইরে ভোরের আলো ফুটে উঠতো। বাশারদা বুকে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে গান ধরতো, আয়ে না বালম, ক্যা করু সজনী.. .. কান্না উথলে উঠতো। ফুঁপানি দিয়ে শেষ হতো গান। চটকা ঘুমের শেষে সকালে বিছানা তুলতে গিয়ে দেখতাম, চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে সাহানার মুখ আঁকার চেষ্টা করেছে বাশারদা।

আমার ট্রান্সফার হলো। বহরমপুরের ভূত হয়ে ফিরে এলাম বনগাঁয়। তখন রৌরবের বহরমপুর কেন্দ্র ভেঙে বনগাঁয় একটা অফিস গড়ে উঠলো। হৃষিকেশও কাঁদিতে একটা রৌরবালয় খুললো। রৌরব তিন জায়গা থেকে প্রকাশ পেতে শুরু করলো। বনগাঁয় রৌরবের সম্পাদক হলো অরুণ বৈরাগী। সে ক্লাশ এইট থেকে বিড়ি খায়। স্কুলের পরীক্ষা দিতে বাড়ি থেকে বেরুলে মা লুকিয়ে পিছন পিছন যায়। বারোটা বাজলেও ছেলে যেনো পরীক্ষার হলে ঢোকে। নইলে কোথাও আড্ডা দিতে বসে পড়বে! সে ছেলের কাছে পরীক্ষা বিড়ির ধোঁয়া বৈ তো নয়! দুই হাতে সমান ক্যারম খেলে। ডাঁই মেডেল ঘরে। বিশ বছর ধরে দাবা খেলে যাঁদের তিনমাথা এক হয়ে গেছে, ছ’মাস শিখে তাঁদের বলে বলে কিস্তি দেয়। ছাদে বসে নিজে নিজেই গীটারে মোহিত করা সুর তোলে রাত বিরেতে। প্রথম সংখ্যাতেই আবুল বাশারের ‘চোর’ গল্প ছাপলো। শিলাদিত্য (পত্রিকা) গল্পটা রিপ্রিন্ট করলো। সাগরময় ঘোষ ডেকে পাঠালেন, বাশারদাকে। আমরা বললাম- ‘দেশে’ লিখবেন লিখুন। মাথা বিকিয়ে দেবেন না। বাশারদা কথা শুনলো না। ‘দেশ পত্রিকা’য় চাকরি নিয়ে ঢুকে গেলো। হারাধনের একটি ছেলে রৌরব থেকে খসে পড়লো।

শিলচর থেকে পরম ভট্টাচার্য 'প্রতিস্রোত' পত্রিকায় একটি গল্প লিখেছেন। গল্পটি নাকি হিন্দুধর্ম নাশ করে ফেলবে। হিন্দুর ধ্বজাধারীরা ধর্ম বাঁচাতে সদলবলে এগিয়ে এলো। পুড়িয়ে দিলো পত্রিকার সব কপি। লেখকসহ পত্রিকার কর্মকর্তারা প্রাণভয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। (সংখ্যাটি হারিয়ে ফেলেছি। খবরের জন্য কবি সমরজিৎ সিংহের কাছে ঋণী।) ইহা সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন। ইহা সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার। অতএব অসহ্য। প্রতিবাদে গল্পটি ফের ছাপা হলো রৌরবে। বহরমপুরের বইমেলায় সংখ্যাটি দিয়ে স্টল আলো করা হলো।
-আয় রে, হিন্দুর দারোয়ান, চৌকিদারের দল।
বলে, বুক চিতিয়ে বসে পড়লাম স্টলে। ধ্বজাধারীরা ঠিক খবর পেয়ে গেছে। ধ্বজার নাম করে লাঠিসোটা নিয়ে হাজির। শেষে পালিয়ে পথ পাইনে। পত্রিকার স্টলে পত্রিকাই ছিলো। আমরা কেউ ছিলাম না। সেবার নাস্তিক টাস্তিক কেউ কিছু ছাপ্পা দেয়নি বটে। তবে ধ্বজাধারীরা ক্ষমতায় এলে সবার আগে যে আমাদের কচুকাটা করবে, এ বিষয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছে রৌরব দপ্তরে।

বইমেলা বসেছে, কোলকাতা রবীন্দ্রসদনের সামনে (এখন মোহর কুঞ্জ)। রৌরব বাহিনি তখনও পৌঁছায়নি। স্টল সাজানো চলছে। পেচ্ছাবখানা থেকে ফিরে শুনি চাঁদুকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। প্রেমিক হাঁদাগঙ্গারাম কমল বিয়ে করেছে হিন্দুর মেয়ে ছবিকে। বিয়ে দিয়েছে চাঁদু এণ্ড রৌরব কোং। কেস করেছে মেয়ের বাড়ি। থাকলো পড়ে স্টল। পার্কস্ট্রিটে শান্তি (লাহিড়ি, সুনীল-শক্তির ট্রায়ো)দার অফিস। ছুটলাম অরুণ আর আমি। – বাঁচাও, শান্তিদা!
শান্তিদা সেবার অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছিলো। তাঁর চোখে চাঁদু তখন হিন্দু-মুসলিম মিলনের মহাপুরুষ, আর আমাদের চোখে চাঁদু-আতঙ্ক, পুলিশের কাছে জেলে পোরার সুলুক কাঠি, রৌরবের অনেকেই তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড। একমাত্র অসীমদা বুক চিতিয়ে পুলিশকে ফেস করলো- হ্যাঁ, কমল ছবি রাতে আমার এখানে ছিলো।
চাঁদুদের বাড়িঘরে কারা যেনো গ্যাস ছড়িয়ে লুট করার, আগুন লাগাবার ধান্দা করছে। খবর পেয়ে বাবুয়া (অনুপম ভট্টাচার্য) চাঁদুর সোমত্ত বোন চম্পা আর মাকে টেনে নিয়ে গেলো নিরাপদ আশ্রয়ে। শহর থমথম করছে। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা এই লাগে বুঝি সেই লাগে।

ইল্লত যায় না ধুলে চাঁদুর জ্ঞান হয় না ম'লে। হৃষিকেশের লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো দিদি। দিদির সৌন্দর্য্যের টানে যতো তারচেয়ে বেশি আদর করে খাওয়ানো সজনের শাকভাজা গেঁড়িগুগলির ঝোল ভাত খাওয়ার টানে ছুটে যেতাম। কেতে বসলে দিদি উদোম পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। তালপাতার পাখায় বাতাস করে। সুন্দরী হওয়ার অপরাধে, কোন এক হাইপাওয়ার বডি দিদিকে বে-আইনি ভোগ দখলে তুলে নিয়ে গেলো। আটকে রাখলো রাখনি করে। মগের মুল্লুক! প্রতিবাদে গর্জে ওঠার আয়োজনে চাঁদু ঘনঘন কাঁদি যাতায়াত শুরু করলো। একদিন দশচাকার এক ট্রাক চাঁদুকে পিষে দিয়ে চলে যাচ্ছিলো। সময় মতো লাফ মেরে ড্রেনের হাবোড়ে না পড়লে, প্রতিবাদের ভবলীলা সেদিনই সাঙ্গ হয়ে যেতো। চাঁদু বেঁচে গেলো। কিন্তু হৃষিকেশ বাঁচলো না। প্রতিবাদের জেরে হৃষির ডেডবডি পাওয়া গেলো, বোলপুর ভেদিয়া স্টেশনের রেললাইনে। এক মুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখা কবি হৃষি যেনো রেলে গলা দিয়েছে। ইল্লি! এতো বড়ো স্বপ্ন নিয়ে কেউ সুইসাইড করে? রৌরব কেনো গোটা কাঁদি জানে, এটা পরিকল্পিত খুন। কোনো হদিশ হয়নি। হারাধনের আর একটি ছেলে রৌরব থেকে খসে গেলো।

শান্তিময় শুনেছি কলেজে নকশাল করতো। পুলিশ তাড়া করলে পালিয়ে রাত কাটাতো সমরদার (সমরেন্দ্রনাথ রায়, সমিধ পত্রিকার সম্পাদক) বিছানায়। সমরদাকে উস্কাতো নকশাল করতে। কোত্থেকে কোত্থেকে নতুন নতুন কবি, লেখক না পারলে তাঁদের লেখা ধরে এনে উস্কাতো তাঁদের লেখা ছাপার জন্য। কতো অজানারে, কতো প্রতিভারে জেনেছি শান্তিময়ের দৌলতে! উস্কানোই ছিলো ওর কাজ।

খবর দিলো, পৃথিবীতে আলবেনিয়া নামে একটা দেশ আছে। সেখানে সমাজতন্ত্রের আদর্শে রাষ্ট্র চলে। (ইসলামপুর লাইনের সাড়ে এগারো মাইল বাসস্টপের নিখিলদা, [কবি নিখিলকুমার সরকার] জানিয়েছিলেন খবরটা ভুল ছিলো।) খোঁজ খোঁজ খোঁজ। কোত্থেকে বেরিয়ে পড়লো গদার পার্টি। নাকি ভগৎ সিংয়ের তৈরি। ইতিপূর্বে নাম শুনিনি। দিল্লিতে আখড়া। ওরা কমরেড হোজার দেশ আলবেনিয়ার অনুসারী। অন্ধের দলে, কাণার মরণ ঝাপসা। এ বি সি ডি জানি। দায় পড়লো গদার পার্টির সাথে যোগাযোগ করার। ইংরিজিতে চললো চিঠি লেখালিখি। একদিন লাটলাট বইপত্তর বোগলদাবায় নিয়ে নিয়ে বলরাম শর্মা, প্রকাশ শর্মা দুই গদার কমরেড এসে হাজির আমার সাউথ সিঁথির কোয়ার্টারে। অতিথি মানুষ। বাঙালি খেয়ে মরে আর খাইয়ে মরে। বাঙালি আতিথেয়তার বদনাম করা যাবে না। অতএব ইলিশ, পাঁঠার মাংস, পায়েস, পিঠে চাকুমচুকুম হলো। খেয়ে টয়লেট আর বিছানা ঘনঘন তাঁদের আসা যাওয়া শুরু হয়ে গেলো। পথের মাঝে হাতের জলে নদী বইয়ে দিলো। আন্দোলন, বিপ্লব শিকেয়। আতিথ্যের বহরে শেষে খুনের দায়ে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম।

বের হলো 'আলবেনিয়া এক'। কোলকাতার বইমেলাতে এক দমকায় নিঃশেষ। শেষ কপিখানা 'নট ফর সেল' লিখে টেবিলে প্রদর্শনীর জন্য রেখে দেওয়া হলো। প্রদর্শকের ভীড়ে টিকিট বসালে দলবেঁধে আলবেনিয়া পৌঁছে যাওয়ার খরচ যদি নাও উঠতো দ্বিতীয় সংখ্যার খরচ নিশ্চিত উঠে আসবে সেই উৎসাহে বেরিয়ে পড়লো 'আলবেনিয়া দুই'। দ্বিতীয় সংখ্যায় একটা লেখা ছাপা হলো, 'মাও সে তুং চিন্তা একটি মার্কসবাদ বিরোধী তত্ত্ব'। [অনুবাদ করেছিলো, নাসের (হোসেন)] ব্যস, মাও সে তুংয়ের ক্যালকেশিয়ান সন্তান সন্ততিগণ খেপে ব্যোম। হুঙ্কার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন আড্ডায় আড্ডায়। সংখ্যাটি তখন ছড়িয়ে পড়েছে স্টলে স্টলে। পেলেই পত্রিকা জ্বালিয়ে দেবে, সঙ্গে আমাদেরও। কোলকাতায় সবেধন নীলমণি তখন আমি আর গোপাল, খবর পেয়ে চাঁদু এলো। বুকমার্ক, পাতিরাম, কাগজের বাঘ (পত্র, পত্রিকা বিক্রির কাউন্টার), যেখান থেকে যতটা পারলাম, কুড়িয়ে কাঁড়িয়ে 'আলবেনিয়া দুই' লুকিয়ে ফেললাম, গোপালের গুহায়। পুড়ে অবশ্য মরিনি। তবে আমাদের গায়ে ছাপ্পা পড়ে গেলো 'রৌরব' গদার পন্থী।

এর মধ্যে বাপে তাড়ানো, সৎমায়ে খেদানো রৌরবের সত্যজিত (ভট্টাচার্য, কবি) কোলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রায় অনাথ অবস্থায়, বিনি চিকিৎসায় মরে গেলো। খবর ঠিকঠাক বহরমপুরে পৌঁছোলো না। মরার দিন মেডিকেল কলেজ চত্বরে পুলিশের লাঠি খাওয়া, স্তালিন বিশেষ সংখ্যায় ওয়ানফোর্থ ডিমাই সাইজের প্রথম পাতা উৎসর্গ করা, আর সত্যজিতের একখানা বই বের করা ছাড়া রৌরব কিছুই করতে পারেনি। করার সামর্থ ছিলো না। হারাধনের আর একটা ছেলে রৌরব থেকে হারিয়ে গেলো।

'মস্কো মামলা'(বই)খ্যাত মণি গুহ, ছোট্টখাট্ট মানুষটি। ফর্সা টকটকে রঙ। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবী পাজামা মোড়া। বয়স আশি (প্রায়)। চাঁদুর ঘরের ভিতর থেকে জানলার গরাদ গলিয়ে দেখলাম। লাফ মেরে রিক্সা থেকে নামলেন। বুকে সমান্তরাল লোহার রডের আড়াল। যেনো জেলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছেন।

রৌরবের বিশেষ স্তালিন সংখ্যা বেরুবে। নামহীন সম্পাদনা করবেন মণি গুহ। স্তালিন বিষয়ে অগাধ অধিকার। অথরিটি। টানটান মেরুদণ্ড। চৌকিতে একটু নিচু হয়ে অবলীলায় সাল, তারিখ, রেফারেন্স দিয়ে লিখে চলেছেন প্রত্যেকটি লেখার শীর্ষ ভূমিকা। আশিতেও বিরাশি সিক্কার স্মরণ শক্তি।

আর একজন বেঁটে কালো মানুষ, তিনিও স্তালিন বিশেষজ্ঞ। থাকেন কোলকাতার শ্যামবাজার মোড়ে। দু'খানা ঘর। শেলফ আলমারী বাক্স মেঝে ঠাসা বইয়ের গুদাম। বইয়ের লাটে লুকিয়ে কোথায় পড়াশোনা করেন ঘরের মধ্যে ঢুকে খুঁজলেও পাওয়া যায় না। চেঁচিয়ে ডাকতে হয়।

বইয়ের স্তূপের আড়াল থেকে সাড়া দেন। বনবিহারী চক্রবর্তী, ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট, বি বি সি নামেই খ্যাত। মণি গুহ স্তালিন কর্মকাণ্ডে আছেন শুনে বেঁকে বসলেন। লিখবেন না। কিছুতেই না। দুই নেতার সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। সহসম্পাদক গোপাল উপাধি পেয়েছে বদর বদর। কেউ কোনো বিষয়ে 'না' বললেই ওর যুক্তির বাঁধ খুলে যায়। শুরু হয় বদর বদর। বদরের স্রোত থেকে

জোয়ার, বান, বন্যা.. ভেসে ডুবে হাঁসফাঁস অবস্থা থেকে বাঁচতে বিবিসি লিখতে রাজি হলেন। পাণ্ডিত্যের সাথে যুক্তিতে গোপাল ছিলো ক্ষুরধার। সরল সোজা ল্যাম্পপোষ্টের মতো অন্ধকারে আলো জ্বলা একা এক যৌবন। প্যাঁচ পঁয়জার বুঝতো না। কিছু বোঝাতে শুরু করলেই আমাদের হয়ে উঠতো ছেড়ে দে মা কেঁদে এবং হ্যাঁ বলে বাঁচি অবস্থা।

ছান্দসিক প্রবোধ সেন কিন্তু গোপালকে চিনতেন না।

সেদিন তাঁর শান্তিনিকেতনের বাসায় আমাদের দুপুরের নিমন্ত্রণ। কথা উঠলো ছন্দ বিষয়ে। প্যান্টালুন তুলে জামার হাতা গুটিয়ে বসে পড়েছে বদরবদর। আমরা চোখ টিপছি, চিমটি কাটছি, বাথরুমে ডেকে বোঝাচ্ছি.. .. তিনি বৃদ্ধ, ছন্দের অথরিটি, আমরা ছারপোকাস্য ছারপোকা তারউপর নিমন্ত্রিত, কোনো আবেদনেই গোপালকে থামানো যাচ্ছে না। বুঝি দুপুরের খাওয়াই বন্ধ হয়ে যায়। শেষে প্রবোধ সেন দাদা আসর ভেঙে নিজেই উঠে গেলেন। বৌদিকে পাঠিয়ে আমাদের লজ্জা এবং দ্বিপ্রহারিক অনাহার থেকে বাঁচালেন।

আর একবার কবি শঙ্খ ঘোষের বাড়ি। তখন বিভিন্ন বিষয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে একের পর এক রৌরবের বিশেষ সংখ্যা বেরুচ্ছে। উনি জানতে চাইলেন, 'রবীন্দ্রনাথ'কে নিয়ে রৌরব কী ভাবছে? লজ্জায় আমার মাথা হেঁট। সে কথার উত্তর না দিয়ে গোপাল বলে উঠলো- রৌরব বিশেষ স্তালিন সংখ্যা নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছে। তখনই স্প্রাং রিদম নিয়ে গোপাল উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বাবার কালে আমি স্প্রাং শুনিনি। নাক কান মুলে রণে ভঙ্গ দেওয়ার হাত থেকে বাঁচলাম, যখন দাদা শঙ্খ ঘোষ দু হাত তুলে দিয়ে বললেন, এ বিষয়টি তাঁর জানা নেই।

এমনি এমনি গোপালকে সহসম্পাদক করা হয়নি। বে-রস কাঠের মতো শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতো। চাঁদুসম্পাদকের হুমকি হামকিতে গুটিয়েগাটিয়ে আমরা কেন্নো হয়ে থাকলেও গোপালের বুলডগের কামড়। যুক্তির পেঁচপয়জারে খেলিয়ে চাঁদুকে ঠিক রৌরবের সিদ্ধান্তে গেঁথে ফেলতো।

খবর পাওয়া গেলো, বাংলাদেশের বদরুদ্দিন উমর সাহেব এসেছেন ভারতে। মার্ক্সবাদী দিকপাল। আছেন, কোলকাতার রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের কোনো এক তস্যগলির আত্মীয় বাড়িতে। রৌরব ঠিক করলো, মুখোমুখি আলাপচারিতা ছাপবে। নীলমণি গোপাল যাবে অভিযানে। বাংলাদেশ বনাম ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষের মান-সম্মান সবেধন গোপালের হাতে ছেড়ে দেওয়া রৌরবের কলজেই কুলোলো না। অগত্যা সংগে চললাম। কীর্তিমান গোপাল। এখানেও কীর্তি স্থাপন করে গেছে। কয়েকদিনে কয়েকশো প্রশ্ন দু'জনে মিলে মকশো কষে খাড়া করে ফেললাম। পাঁচপাতার ইন্টারভিউয়াস্ত্র। গোপালকে পই পই করে হুমকি দিয়ে রাখলাম - প্রশ্নের বাইরে, খবর্দার তর্কে মুখ লাগাবিনে। লাগাবিতো সব ভণ্ডুল করে দেবো।

গোঁয়ার-গুম গোপাল অগত্যা মিষ্টি, সরবৎ, সহযোগে দেড় ঘন্টার দুনিয়া কাঁপানো ইন্টারভিউ টেপ করলো। নাচতে নাচতে দুই বন্ধু বিজয় সংবাদ পাঠিয়ে দিলাম বহরমপুরে।

পরদিন দু'খানা তোয়ালে জড়িয়ে টেপ-রেকর্ডার বোগলে গোপাল কাঁপতে কাঁপতে হাজির। মনে হলো দু'জনেরই জ্বর হয়েছে। ভিজেবেড়াল মুখে বললো - কিছুই টেপ হয়নি, মাইরি।

সর্বনাশ! হিটলার চাঁদুর গোঁফওয়ালা স্তালিনিক মুখ, গোপালের অন্তহীন বদর বদর, কাঁচুমাচু মুখে কুলুপ এঁটে দিলাম। যাওয়া হলো এক সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। তিনি বিয়েবাড়ি মাইক বাজান। তাঁর জয়ঢাক মার্কা শব্দবাক্সে টেপরেকর্ডার জুড়ে সাউণ্ড এনলার্জ করে করে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক আওয়াজ ফিসফিস শব্দে উদ্ধার হলো। উফ! সে যাত্রা রেহাই পেলাম। ছাপা হলো বদরুদ্দিন উমরের ইন্টারভিউ।

ডঃ শক্তিনাথ ঝাঁ (আমাদের শক্তিদা)র 'লালন ও তাঁর গান' বইখানা রৌরব প্রকাশ করছে। বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। ছাপা চলছে। বইখানা প্রকাশ করার দুরভিসন্ধিতে দেশ পত্রিকা শক্তিদাকে ফুঁসলিয়ে আধছাপা বইখানা পাণ্ডুলিপিশুদ্ধু ছাপাখানা থেকে তুলে নিয়ে গেলেন। (উল্লেখ্য বাশারদা তখন দেশ পত্রিকায়।) বিখ্যাত উকিল এ পি সি, অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জী বললেন– এ কেসের হিস্টোরিক্যাল মেরিট আছে। এ কেস আমি বিনি পয়সায় লড়বো।

দেশ পত্রিকার সাথে রৌরবের সরাসরি কোর্টকেস। আমি আর গোপাল রোববার হলেই সন্টলেকে এ পি সি র বাড়িতে হত্যে দিই। উনি কেস সাজান, ডিকটেশান দেন, আমি লিখি। পাশে বসে গোপালবদর যুক্তি ফাঁদার যুক্তি শেখায় ভারত বিখ্যাত উকিল এ পি সি কে। কান মাথা ঝালাপালা ধরে যায়। শেষে এ পি সি গোপালকে পাঠিয়ে দিতেন ভিতর ঘরে ফাইল খুঁজতে। যে ফাইলটা রাখা থাকতো এ পি সির পায়ের কাছে।

স্তালিন সংখ্যা বেরিয়ে গেলো। স্তালিনিক হৈ চৈ পৌঁছে গেলো নানান দলে, বে-দলে, দেশে, বিদেশে। প্রকাশের দিন দিল্লি থেকে হাজির দিল্লি সত্যবতী কলেজের অধ্যাপক বিজয় সিং। তিনি আর এক স্তালিন বিশেষজ্ঞ। তাঁর লেখাও স্তালিন সংখ্যায় আছ। মণি গুহ, বি বি সি, নামের সুলম্বা লিষ্ট বানাবার মতো যথেষ্ট সম্মাননীয় সব ব্যক্তি।
কিন্তু বলার বিষয় হচ্ছে বদরের কথার আশ্চর্য মোহিনি শক্তি। স্টেজ আলো করে আদা আর কাঁচকলাকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলো! ধবধবে সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরা ফর্সা মণিদা আর কালো কুচকুচে বি বি সি। সাদা কালো মিলনের আবেগে বি বি সি বোধ হয় কানে কম শুনছিলেন। স্টেজেই চেয়ার টেনে মণিদার কান ঘেঁষে মুখ নিয়ে গেলেন। হায় হায় করেও, আমরা সবাই ভুলে গেলাম অবিস্মরণীয় সেই দৃশ্যের একটা ক্লিক করে রাখতে। মিলনের কীর্তি যেমন গোপালের, এ ঐতিহাসিক ভুলও গোপালের। রৌরব এর দায় নিলো না। আর ভুল করেও গোপাল দিব্যি বেঁচে গেলো সহসম্পাদক বলে! সেই ক্লিক না করা ভুলের বিচারে রৌরবের আড্ডা মাঝে মধ্যেই ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে। আর হো হো হাসিতে ফেটে পড়ে। এহ বাহ্য। স্তালিন সংখ্যার নামডাকের সংগে সংগে হা রে রে শব্দে বাজারে ছড়িয়ে গেলো 'রৌরব' স্তালিন পন্থী। আবার এক নতুন ছাপ্পা সেঁটে গেলো আমাদের গায়।

শুনেছিলাম, কাজল পাগল হয়ে গেছে। একদিন বাসের জানালায় দেখা। পুড়ে শুকিয়ে কাঠকয়লা হয়ে যাওয়া আমাদেরই একজন। বাসের ছোট্ট জানালা দিয়ে হাতমাথাশরীরশুদ্ধু বের করে, হুমড়ি খেয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলো। বাসটা হুশ করে বেরিয়ে গেলো। ওর হাত নাড়া অনেক্ষণ দেখেছিলাম। বাসটা ওকে কোথায় নিয়ে গেছে, কে জানে! আর ফিরে আসেনি। আসলেই বা কী বলতো? হতাশ প্রেমের কথা! কবিতা লিখতে না পারার গল্প!! রৌরবের আর একটা ছেলে হারিয়ে গেলো। আরো কতো হাজার হাজার গল্পের ইতিহাস জমা হয়ে আছে, আবাহমানের গুহায়, রৌরবের দপ্তরে, বাংলা সাহিত্যের এক কাণাগলিতে। সে এক সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাস!

দেনার দায়ে লিটল ম্যাগদের ঘুরেফিরে আসে সেই একই মুখথুবড়ে পড়ার কিস্যা। রৌরবকে জাগিয়ে তোলার শেষ চেষ্টা করেছিলো সমীরণ (ঘোষ) উমা (পদ কর)দা। শেষ দুই খুঁটি এবং কেউ কেউ। পড়ুয়ারা সবিস্ময়ে দেখেছেন, রৌরব তখনও মানুষকে ভালোবাসার পথরেখা এঁকে চলেছে। দাউ দাউ দৃপ্ত ফুলকি স্ফুরিত সংখ্যাগুলি। দেনার দায়ে বিষ খেয়ে মরে গেলো চাঁদু। সবার অজান্তে গোপাল মরে গেলো ক্যান্সারে। রকিবুদ্দিন (ইউসুফ)এর মৃত্যু শয্যায় থাকতে পেরেছিলাম। টি ভি নিউজের ফুটখবরে জানলাম ভজা(গৌতম সেন)নেই। শেষ চলে গেলো কোলকাতা য়ুনিভার্সিটির ফাস্ট ক্লাশ ফার্স্ট কৌশিক (রায় চৌধুরী)। হারাধনের নয় নয় নয়ন তারার দল টুপটুপ করে রক্তমাখা শিশিরের মতো খসে পড়ছে নরকের মাটিতে। পৃথিবীর সেরা ভুল সংখ্যাতত্ত্বের মতো সবাই জানে, রৌরব ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে, এখন জীবিতের চেয়ে তাঁদের মৃতের সংখ্যাই বেশি।
হ্যাঁ, কিন্তু অজানিতেরা! তিন দশকের লড়াইয়ে রয়ে গেছে, থান ইটের মতো 'রৌরব বারো বছর' নামে আরো একখানা সংকলন আর গোঁয়ার গোবিন্দ রৌরবিয়ানদের জীবনগুলো। বুড়ো হাড়ে সমীরণ উমাদা শান্তিময় জীবিত-মৃত বন্ধুরা মিলে দুম করে 'নির্বাচিত শুভ চট্টোপাধ্যায়' সংকলনখানা বের করে ফেললাম। এতোবছর পর জলসিড়ির ক্রোড়পত্রে এই রৌরবপাঠ রেখে বলছি, হ্যাঁ বলছি- রৌরবকে ভুলে যাওয়া অতো সহজ নয়। হে, ভবিষ্যতের পড়ুয়া নরক জীবনের এক ভোরে হঠাৎ দেখবেন, ভূত হয়ে যাওয়া রৌরবিয়ানদের পাঁচিশ বছরের আলো এসে পৌঁছিয়েছে, এক ঢাউস সংকলনে। বহরমপুর শহরের চূড়ায় দাঁড়িয়ে শিল্পসাহিত্যের টেবিল চাপড়ে জানিয়ে যাচ্ছি, রৌরবকে ভুল ছাপ্পা সেঁটে দেওয়া মানুষগুলো যতদিন রয়ে যাবে, 'রৌরবের থেকে' অমৃতের ভূতেরা নিজেরাই নিজেদেরকে ছাপ্পা দিয়ে বলে যাবো, জিও রৌরবিয়ানস, মার্চ এ্যাহেড মার্চ।

*****শেষ*****

(কয়েক দশক পার হয়ে গেছে। সততার সংগে স্মৃতি যেমন যেমন উগরে দিয়েছে, লিখেছি। হয়তো সময়ক্রম এলোমেলো হয়ে গেছে। যদি কারো ভূমিকা অনাবশ্যক স্পষ্ট হয়ে থাকে, কিংবা অহেতুক অস্পষ্ট, অথবা দেখতে না পেয়ে থাকি, সে এই বৃদ্ধের দুর্বল স্মরণ অক্ষমতা। আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখছি।)